প্রকাশকের কথা

নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের ঐতিহাসিক গণআন্দোলনের বিজয়ে শাসকশ্রেণী ও সিপিএম আতঙ্কিত। এই বিজয়ের তাৎপর্য ও প্রেরণা শুধু ঐ অঞ্চলগুলির মধ্যে, তথা এরাজ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, সমগ্র ভারতে, এমনকী বিদেশেও ছড়িয়ে পড়েছে। সকলেই জানেন, এই দুইটি আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই এস ইউ সি আই দল কী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। সিঙ্গুরে পরাজয়ের পর সিপিএম-টাটা ক্ষেপে গিয়ে যৌথভাবে কী অপপ্রচার চালাচ্ছে সেটাও সকলেই লক্ষ্য করছেন। এই অপপ্রচারগুলির জবাবে এবং গণআন্দোলনে প্রাসঙ্গিক কিছু রাজনৈতিক প্রশ্ন নিয়ে এই পুস্তকে আলোচনা করা হয়েছে। এই পুস্তক সম্পর্কে পাঠকদের মতামত আহ্বান করছি।

অভিনন্দন সহ

১ নভেম্বর, ২০০৮ — প্রভাস ঘোষ

৪৮ লেনিন সরণী — সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

কলকাতা ৭০০০১৩ — এস ইউ সি আই

ন্যানো প্রশ্নে
টাটা ও সিপিএমের অপপ্রচারের জবাবে

সিঙ্গুর থেকে টাটারা ন্যানো গাড়ির স্কীম বাতিল করায় সিপিএম নেতারা, শিল্পপতি মহল এবং বশংবদ কয়েকটি কাগজ ও টিভি তারস্বরে এমন ‘গেল গেল’ রব তুলেছে যেন রাজ্যবাসীর দুর্গতিমোচনে রতন টাটা ভাগ্যবিধাতারূপে পশ্চিমবঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত আন্দোলনকারীদের দুষ্কর্মে বিমুখ হয়ে ফিরে গেলেন। ফলে রাজ্যের ভবিষ্যত একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেল।

কিন্তু টাটারা কি রাজ্যবাসীর কল্যাণের জন্যই নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে সিঙ্গুরে ন্যানোর কারখানা করতে এসেছিলেন? এই কারখানা হলে কি হাজার হাজার বেকার যুবকের কপাল খুলে যেত? রাজ্য সরকারের কাজকর্ম দেখে কি মনে হয়, জনগণের দুঃখদুর্দশা দূরীকরণে, বেকারদের কর্মসংস্থানে তারা খুবই ব্যগ্র? এদেশে কিংবা বিদেশে কোথাও কি কোন শিল্পপতি নিছক বেকারদের কর্মসংস্থানের জন্য, এলাকার উন্নয়নের জন্য শিল্পস্থাপন করে? নাকি তাদের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, কোথায় পুঁজি ঢাললে, কত সস্তায় শ্রমিক ও কাঁচামাল পেলে কম্পিটিশানে অন্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়ে কত বেশি মুনাফা লুটতে পারবে? বাজারে সস্তায় মাল বেচার জন্য প্রোডাকশন কস্ট কমাবার প্রয়োজনে উন্নত মেশিন লাগিয়ে কত কম শ্রমিক দিয়ে কাজ করাতে পারবে? এই জন্যই তো অর্থনীতি শাস্ত্রে কথা এসেছে ‘জবলেস গ্রোথ’, অর্থাৎ কর্মসংস্থানহীন ‘উন্নয়ন’। সিঙ্গুরে টাটারা ন্যানো কারখানা করলে কতজন কাজ পেত? অনুসারী শিল্পসহ ন্যানো মিলে এ রাজ্যের, বাইরের ও বিদেশের লোক নিয়ে বড়জোর ১২০০ থেকে ১৫০০ জন, না হয় আরও কিছু বেশি। কিন্তু তার বিনিময়ে ১২০০০ জমির মালিক, ১১০০ বর্গাদার, ১০০০ খেতমজুর এবং এদের প্রত্যেকের পরিবারে মিনিমাম ৪ জন মেম্বার ধরলে অন্তত ৫৫,৬০০ জন গরিব মানুষ জমি ও জীবিকাচ্যুত হত। কোন্‌টা বেশি ক্ষতি? এছাড়া যেখানে রাজ্যে ও দেশে কৃষিজমি কমছে যার ফলে কৃষিবিজ্ঞানীরা উদ্বিগ্ন, সেখানে ১০০০ একর অতি উর্বর জমি ধ্বংস করা হলে সেটাও কি বড় ক্ষতি নয়? এলাকার ক্ষুদ্র নদীর জল ও ভূগর্ভস্থ জল নিয়ে যে ব্যাপক কৃষিসম্পদ সৃষ্টি হতো, সেই জলেরও এক বিপুল অংশ এই গাড়ি কারখানায় ব্যবহৃত হলে আরও কয়েক হাজার একর কৃষি জমির কি ক্ষতি হত্ত না?

টাটা-সিপিএমের জনস্বার্থ রক্ষার নমুনা

খড়্গপুরের অনুর্বর জমি ও সিঙ্গুরের অতি উর্বর জমি টাটাদের দেখানো হয়েছিল। বেশি সুবিধা হবে বলে টাটারা সিঙ্গুর বেছে নিল, রাজ্য সরকারও তৎক্ষণাৎ রাজি হয়ে গেল। অথচ এই টাটাই কিন্তু এখন গুজরাটে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়ে থাকা অকৃষি জমি নিল। তাহলে সিঙ্গুরে টাটার স্বার্থ ও ইচ্ছাই একমাত্র বিবেচ্য গণ্য করা হলো, যারা পুরুষাণুক্রমে ওখানকার জমির মালিক, এবং ঐ জমিতে যে বর্গাদার ও ক্ষেতমজুররা কাজ করত, তাদের স্বার্থ, তাদের মতামতের কোন মূল্য দেওয়া হল না। টাটা ১ লাখ টাকায় গাড়ি বের করে বিশ্ববাজার গ্রাস করবে, প্রচুর লাভ করবে, আর সেই প্রয়োজনের যূপকাষ্ঠে সিঙ্গুরের অতি উর্বর ১০০০ একর কৃষিজমি ও ৫৫,৬০০ গরিব মানুষকে বলি দিতে হবে। এটাই তো রাজ্য সরকারের 'জনস্বার্থ রক্ষার স্কীম'!

অন্যদিকে যে টাটা দেশে বিদেশে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়ে কারখানা-খনি-জমি কিনছে, সম্প্রতি ৫৫,০০০ কোটি টাকা দিয়ে ইংল্যাণ্ডে কোরাস কোম্পানি কিনেছে এবং এমনকী এবার গুজরাটে ন্যানোর জমি নগদে ৫০০কোটি টাকায় কিনেছে, সেই টাটাই সিঙ্গুরে এসে এত দরিদ্র হয়ে গেল যে, সিপিএম সরকার পাবলিক মানি থেকে প্রায় ১০০০ কোটি টাকা খরচ করে একরকম প্রায় বিনা পয়সায় টাটাকে জমি দিয়ে দিল। ১৫ শতাংশ সুদে ব্যাঙ্ক থেকে ধার করে ২০০ কোটি টাকা ০.১ শতাংশ সুদে টাটাকে ঋণও দিল! গরিব টাটার প্রতি রাজ্য সরকারের এতই বদান্যতা! সুদে-আসলে এই টাকার বোঝাও রাজ্যবাসীকেই বহন করতে হবে। এটাও কি 'জনস্বার্থে'ই করা হয়েছে? অথচ, এই সরকার যদি স্বনিযুক্তি প্রকল্পে বেকার যুবকদের ১ শতাংশ সুদে ১ লক্ষ টাকা করে ঋণ দিত, তাহলে অন্ততঃ ২০,০০০ জনের কর্মসংস্থান হতে পারত। কিন্তু বেকার দরদী(!) সরকার তা পারল না। সিপিএম নেতারা দুহাতে টাকা কামাবার জন্য কেন্দ্রীয় আইন লংঘন করে জুনিয়ার বেসিক ট্রেনিং কলেজ খুলে হাজার হাজার ছাত্রকে ট্রেনিং দিয়েছিল, সম্প্রতি এটা বেআইনি ঘোষিত হওয়ায় প্রায় ৪৩,০০০ কর্মরত শিক্ষক কর্মচ্যুত হবেন এবং ৩৫,০০০ ছাত্রছাত্রী কাজ পাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। এরা প্রায় সকলেই ধারদেনা করে জমিবাড়ি বন্ধক রেখে মাথাপিছু এক দেড় লাখ টাকা করে ট্রেনিং বাবদ শিক্ষার ব্যয় জুগিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার নাকি জানিয়েছিল ৫২ কোটি টাকা জরিমানা দিলে এদের ডিগ্রি বৈধ করা হবে। কিন্তু বেকারদরদী(?) সিপিএম সরকার মাত্র ৫২ কোটি টাকা দিতে রাজি না হওয়ায় এই ৭৮ হাজার নিরপরাধ অসহায় বেকার যুবকদের ভবিষ্যত নষ্ট হয়ে গেল। ইতিমধ্যে এদের ছয়জন আত্মহত্যাও করেছে। এখনও এদের ভবিষ্যত সম্পূর্ণ অনিশ্চিত, রাজ্য সরকারের বিন্দুমাত্র উদ্যোগ নেই। এইভাবে ছয়জন কর্মপ্রার্থী যুবককে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিতে এবং ৭৮ হাজারের ভবিষ্যত নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে এই বেকার দরদী সরকারের এতটুকু বাধল

না! এদের ক্ষেত্রে নিষ্ঠুর হলেও টাটার ক্ষেত্রে কিন্তু এই সরকারকেই খুবই সদয় দেখা গেল। সরকারি দপ্তরে ৩ লক্ষ, প্রাইমারিতে ৫৫ হাজার, সেকেন্ডারিতে শিক্ষক ৩০ হাজার, অশিক্ষক কর্মচারীর ২০ হাজার পদ খালি আছে। রাজ্যে এত শিক্ষিত বেকার অথচ টাকা নেই এই অজুহাতে সরকার এই খালি পদগুলিতে নিয়োগ করছে না। তাছাড়া একই অজুহাতে সামান্য মজুরিতে সরকার হাজার হাজার পার্ট টাইম টিচার ও কনট্রাক্ট লেবার নিয়োগ করেছে। সেই সরকারই কোন যুক্তিতে, কার স্বার্থে, টাটার জন্য রাজ্যবাসীর এত কোটি কোটি টাকা ঢালল? রাজ্যে প্রায় প্রতিবছরই মেদিনীপুর-মুর্শিদাবাদ-মালদায় বন্যায়, নদীভাঙনে কত লক্ষ লক্ষ পরিবার সর্বস্ব হারাচ্ছে, কিন্তু টাকা নেই এই অজুহাতে এক্ষেত্রেও সরকার কোন স্থায়ী প্রতিকার করছে না। টাকা নেই এই যুক্তিতে শিক্ষা ও চিকিৎসা ব্যবস্থার ব্যবসায়ীকরণ এবং ব্যয়বহুল করিয়ে গরিব-মধ্যবিত্তদের শিক্ষা-চিকিৎসার সুযোগও সরকার বন্ধ করে দিচ্ছে। অথচ সেই সরকারই টাটার ক্ষেত্রে এত দরাজ কেন? কেন টাটার সাথে 'জনস্বার্থে' রচিত চুক্তিকে গোপন রাখার জন্য সরকার ও টাটার এত সতর্কতা? একদিকে ৮ কোটি রাজ্যবাসীর স্বার্থের কথা বলা হচ্ছে, অন্যদিকে এই চুক্তির শর্ত রাজ্যবাসীকে জানতে দেওয়া হবে না, মন্ত্রীসভা জানতে পারবে না, শরিকদলগুলি জানতে পারবে না, সিপিএমের সাধারণ কর্মী ত দূরের কথা, সম্ভবত এমনকী রাজ্য কমিটিও জানতে পারবে না। শুধু জানবেন মুখ্যমন্ত্রী-শিল্পমন্ত্রী-শীর্ষস্থানীয় নেতারা এবং স্বয়ং টাটা। তাহলে 'জনস্বার্থেই' কি এই চুক্তির শর্ত গোপন করা?

সিপিএম নেতারা ও তাদের অনুগত সংবাদমাধ্যমগুলি সমানে বলছে, বেকার যুবকদের দুঃখে তাদের ঘুম হচ্ছে না। তাই তারা শিল্প চান, কিন্তু আমরা অর্থাৎ আন্দোলনকারীরা 'শিল্পবিরোধী', আমরা 'বেকারদের ভবিষ্যত নষ্ট করছি'। বাস্তব কী বলে? রাজ্যে গত ৩১ বছরে 'শিল্পায়নের জোয়ারে' প্রায় ৫৬০০০ যেসব ছোট-মাঝারি-বড় কারখানা বন্ধ হয়ে গেল, ২১ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী ছাঁটাই হয়ে গেল, সেগুলি চালু রাখার, বন্ধ কারখানা খোলার কোথাও কি এতটুকু উদ্যোগ সরকার নিয়েছে? চটকলে-চাবাগানে-তাঁতশিল্পে-ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে প্রায় প্রতিদিন ছাঁটাই হচ্ছে। সম্প্রতি হিন্দমোটরসে ব্যাপক ছাঁটাই হল, সরকার এগুলি রোধ করবার কি কোন চেষ্টা করেছে? মালিকরা শ্রমিকদের প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ড-গ্রাচুইটির কোটি কোটি টাকা আত্মস্যাৎ করে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে শ্রমিকদের তাড়াচ্ছে। এর প্রতিকারে আইন থাকা সত্ত্বেও সরকার কেন নির্বিকার? কেন রাজ্য সরকার অধিগৃহীত কারখানার রুদ্ধ দ্বার খুলছে না? এরপরও কি সরকার দাবি করতে পারে যে তারা শিল্প স্থাপনে ও কর্মসংস্থানে খুবই ব্যগ্র? বরং আমরাই দাবি জানিয়ে আসছি — সকল বন্ধ কারখানা খুলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারীকে পুনর্বহাল করা হোক, রাজ্যের লক্ষ লক্ষ একর অকৃষি অনুর্বর জমিতে নতুন শিল্প করা হোক। কিন্তু শিল্পস্থাপনের

নামে দেশিবিদেশি পুঁজির স্বার্থে ও মর্জিতে উর্বর কৃষি জমি ধ্বংস করা চলবে না, হাজার হাজার চাষি-বর্গাদার-খেতমজুরের জীবন-জীবিকা বলি দেওয়া চলবে না।

'সিঙ্গুরে ন্যানো কারখানা না হলে, কোনও শিল্পপতি এ রাজ্যে আসবে না, যারা আছে তারাও কারখানায় তালা লাগিয়ে চলে যাবে' এটাও সম্পূর্ণ মিথ্যাপ্রচার। কোন দেশেই পুঁজিপতিরা এমন আদর্শবাদী নন যে, মুনাফা লোটার সুযোগ থাকলেও তারা আন্দোলনবিরোধী বলেই পুঁজি না ঢেলে বা তুলে নিয়ে গিয়ে সন্ন্যাস ব্রত নেবে। বরং উল্টোটাই সত্য। পুঁজিপতিরা আসে, পুঁজি ঢালে কোনও জনকল্যাণে নয়। আসে স্রেফ নিজেদের গরজে, মুনাফা লুণ্ঠনের প্রয়োজনে। এমনকী পরদেশ আক্রমণ করে দখল করেও তারা পুঁজি ঢালে শোষণের প্রয়োজনে, ব্রিটিশরা যা এদেশে করেছিল। ইরাকেও মার্কিন পুঁজির স্বার্থেই ধ্বংস কাণ্ড চলছে, যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের পুঁজির স্বার্থেই অতীতে দু'বার বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ আগুন জ্বলেছিল। যতক্ষণ তাদের মুনাফার সুযোগ থাকে, না ডাকলেও আসে, হাজার আন্দোলন হলেও তারা যায় না। যেমন ব্রিটিশ শাসনে, কংগ্রেস আমলে এই রাজ্যে সবচেয়ে বেশি শ্রমিক ধর্মঘট হয়েছে, আন্দোলন হয়েছে, কিন্তু তখন এ রাজ্যই শিল্পে দেশে প্রথম স্থানে ছিল। তাই টাটারা ন্যানো না করলেও সিঙ্গুরের জমি কিন্তু ছাড়ে নি। এ রাজ্য থেকে অন্য শিল্পও তারা তুলে নিয়েও যায় নি। অন্য শিল্পপতিরাও কেউ এরাজ্য থেকে চলে যায় নি। বরং যাবে না বলেই জানিয়েছে। কেউ কেউ নতুন করে আসছেও।

সিপিএমের গোয়েবলসীয় মিথ্যাপ্রচার

শিল্পমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, প্রধান বিরোধী দল ও অন্য কয়েকটি দল সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থে ধ্বংসাত্মক কাজ করছে, কোথাও শিল্প ও রাস্তার জন্য জমি নিতে দিচ্ছে না, আন্দোলনের নামে রক্ত ঝরাচ্ছে। এই অভিযোগ তৃণমূল কংগ্রেস, এস ইউ সি আই সহ আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে তোলা হয়েছে। রতন টাটা অভিযোগ করেছেন, মমতা ব্যানার্জী অর্থাৎ আন্দোলনকারীরা তার উপর ট্রিগার টিপে গুলি চালিয়েছে, সিঙ্গুরে কারখানার প্রাচীর ভেঙেছে, বোমা মেরেছে, কর্মচারীদের আক্রমণ করেছে। রতন টাটা ও সিপিএম মন্ত্রীরা তাজবেঙ্গল হোটেলে দীর্ঘক্ষণ খানাপিনা ও শলাপরামর্শ করে একই দিনে পর পর আলাদাভাবে এই অভিযোগ তুলেছেন। সন্দেহ নেই রতন টাটা ও সিপিএম নেতৃত্ব যথেষ্ট বুদ্ধিমান এবং তাদের অর্থ ও প্রচারের শক্তির জোরও অনেক বেশি। কিন্তু সেজন্য রাজ্যের জনগণকে এত বোকা ভাবার কোন কারণ নেই যে ফ্যাসিস্ট হিটলারের সাকরেদ গোয়েবলসের কায়দায় ওরা প্রচার চালালেই রাজ্যবাসী মিথ্যাকে সত্য বলে মেনে নেবে। সিঙ্গুরে অতি উর্বর কৃষিক্ষেত্র ধ্বংস করেছে কারা? কারা নন্দীগ্রামকে ধ্বংস করতে হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল? কারা বারবার সিঙ্গুর-

নন্দীগ্রামে রক্ত ঝরিয়েছে? কারা সিঙ্গুরে রাজকুমারকে খুন - তাপসীকে ধর্ষণ ও খুন করেছে এবং ৪ জনকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিয়েছে? কারা নন্দীগ্রামে ব্যাপক গণহত্যা ও গণধর্ষণ চালিয়েছে? যে জনগণ বারবার এই বর্বর ফ্যাসিস্ট অত্যাচারের প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছে, তারা কি এই খুনিদের ভুলতে পারে? সিঙ্গুরে তো ধর্ণা আন্দোলন আগাগোড়া শান্তিপূর্ণ ছিল। আন্দোলনকারীরা বোমাও মারেনি, প্রাচীরও ভাঙেনি, কর্মচারীদের আক্রমণও করেনি। বরং প্রতিদিন যে হাজার হাজার মানুষ ধর্নামঞ্চে হাজির হয়েছিল, তাদের মধ্যে বিক্ষোভের যে আগুন ছিল, একবার নেতৃত্ব ডাক দিলে তারা ওখানকার সবকিছু গুঁড়িয়ে দিতে পারত, হাজার পুলিশ-মিলিটারি নিয়েও সরকার যে তা রক্ষা করতে পারত না, এটা কি কেউ অস্বীকার করতে পারে? বিরোধীরা আন্দোলন করে বাধা দিলে খড়্গপুরে টাটা, শালবনীতে জিন্দালরা এবং পুরুলিয়ায় বালাজী ও অন্যেরা কয়েক হাজার একর জমি পেতে পারত কি ? ঐ সব স্থানে বাধা দেওয়া হয় নি, কারণ এগুলি অনুর্বর ও অকৃষি জমি। ফলে 'সর্বত্র বাধা দেওয়া হচ্ছে', এটাও ডাহা মিথ্যা প্রচার। এই ধরনের মিথ্যাপ্রচারে সিপিএম নেতারা খুবই সিদ্ধহস্ত।

বিদেশি বহুজাতিক কোম্পানি সালেমদের প্রতি সিপিএম কতটা দায়বদ্ধ নন্দীগ্রামের নৃশংসতায় রাজ্যবাসী তা আগে প্রত্যক্ষ করেছে। এবার প্রত্যক্ষ করছে সিঙ্গুরে দেশিয় একচেটিয়া পুঁজি টাটাদের প্রতিও সিপিএমের আনুগত্য। কোনও আলোচনার দরকার নেই, জমির মালিক স্থানীয় মানুষের মতামতের প্রয়োজন নেই। গদিতে বসে যেন গোটা রাজ্যের মালিক হয়ে গেছে সিপিএম নেতারা, যাকে যা খুশি জমি দিয়ে দিতে পারে! আচমকা সরকারি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর ঔপনিবেশিক স্বৈরাচারি আইন প্রয়োগ করে জমি দখলে সশস্ত্র হামলা চালাল সরকার, নিজেদেরই জমি রক্ষাকারী গরিব পুরুষ-মহিলাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালাল, এমনকী বিদ্যুতের আলো নিভিয়ে অন্ধকার রাতে ঘরে ঘরে পুলিশি হামলা হল। ভয়-ভীতি-সন্ত্রাস চালিয়ে জবরদস্তি কিছু চাষীর 'সম্মতি' আদায় করে নেওয়া হল। এই সংখ্যাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে প্রচার করে সরকার আরও কিছু মানুষের মনোবল নষ্ট করে 'সম্মতি' আদায় করে নিল। তা সত্ত্বেও প্রায় ৩০০০ জন অসম্মত হয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মেজরিটি যদি 'স্বেচ্ছায়' জমি দিয়ে থাকে, তাহলে ওখানেই পঞ্চায়েত ভোটে সিপিএমের এমন বিপর্যয় হল কেন?

রাজভবন চুক্তি নিয়ে দ্বিচারিতা

এবার যখন ধর্ণা আন্দোলন শুরু হল, প্রথমেই মুখ্যমন্ত্রী-শিল্পমন্ত্রী জানালেন 'অধিকৃত' এলাকায় আইন অনুযায়ী এক ছটাক জমি ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়, দেওয়ার মতো কোন 'উদ্বৃত্ত' জমিও আর নেই, মূল কারখানা ও অনুসারী শিল্পে সব জমিই

লাগবে। সরকার আরও জানাল, অনুসারী শিল্পকে মূল প্রকল্পের গায়েই করতে হবে, আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে সামান্য দূরে সরালেও খরচ অনেক বেড়ে যাবে এবং ১ লক্ষ টাকায় গাড়ি দেওয়া সম্ভব হবে না। অথচ সেই টাটাই প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, এখন গুজরাটের সানন্দ-এ মূল প্রকল্পের বেশ কিছু কিমি দূরে অনুসারী শিল্প করছে কি করে? আন্দোলনের ব্যাপকতা বাড়ার পর রাজ্য সরকার জানাল প্রকল্পের ভেতর থেকে ৪০ একর জমি দেওয়া হবে, বাকি জমির জন্য নগদে দাম ও কিছু ক্ষতিপূরণ বাবদ টাকা দেওয়া হবে। আইনে সম্ভব না হলে এই ৪০ একর ফেরৎ দেওয়ার কথা পরে কি সরকার করে বলতে পারল? কিন্তু আন্দোলনকারীরা প্রকল্পের ভেতরে ৩০০ একর ও বাইরে ১০০ একর জমির দাবিতে অটল থেকে লড়াই চালিয়ে গেল। এরপর সমগ্র রাজ্যবাসী ও দেশের জনগণ টিভি-র মাধ্যমে দেখল রাজভবনে দীর্ঘক্ষণ দফায় দফায় আলোচনার পর রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও মমতা ব্যানার্জীর উপস্থিতিতে শিল্পমন্ত্রী ও প্রধান বিরোধী দলনেতার স্বাক্ষরিত বিবৃতি জানাল যে, সরকার আন্দোলনকারী চাষীদের প্রকল্পের ভেতরে ম্যাক্সিমাম ও বাইরে বাকি জমি দেবে এবং এই জমি ৭ দিনের মধ্যে খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব পড়ল ৪ জনের একটি কমিটির উপর, যার মধ্যে ছিলেন হুগলি জেলার ডিএম ও স্থানীয় তৃণমূলের এমএলএ সহ দুই পক্ষের আরও দুইজন। সকলেই ভেবে আশ্বস্ত হল যে, শেষ পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হল। কিন্তু সকলেই অবাক হয়ে দেখল যে, পরদিনই মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে শিল্পমন্ত্রী জানালেন, এইভাবে জমি দেওয়া সম্ভব নয়। তার পরে জমি খোঁজার দায়িত্বে থাকা কমিটিও ৪ দিনের মাথায় ভেঙে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানালেন বড়জোর প্রকল্পের ভেতরে ৭০ একর জমি এবং ক্ষতিপূরণে কিছু আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া যেতে পারে। সিপিএম সরকার যে এভাবে নিজের স্বাক্ষরিত চুক্তি নিজেই ছিঁড়ে ফেলবে, এটা কেউ ভেবেছিল? এর দ্বারা তো রাজ্যবাসী ও আন্দোলনকারীদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা হল। এই দেশের অন্য কোন সরকার এবং এমনকি বিদেশেও কেউ এমন আচরণ করেছে বলে আমাদের জানা নেই। এ নিয়ে এ রাজ্যে ও বাইরে যখন বহু কথা উঠল এবং কোন কৈফিয়তও যখন কাজ করল না, তখন অনেক ভেবেচিন্তে এতদিন বাদে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক অবশেষে জানালেন, 'রাজভবনে চুক্তি হয়নি, ওটা একটা ঘোষণা ছিল মাত্র।' এই উত্তরে বাইরের লোক তো দূরের কথা, তার নিজের দলের লোকেরাও কি সন্তুষ্ট হবে? এরপরও কি এই সরকারকে এতটুকু বিশ্বাস করা চলে?

সরকার নিজের চুক্তি নিজেই কেন একতরফা ভাঙল, সেটাও অনেকের প্রশ্ন। হয়ত সিপিএম নেতৃত্ব আগেই শয়তানি করে ঠিক করেছিল, এভাবে চুক্তি ঘোষণা করে আন্দোলন থামিয়ে পরে তা অস্বীকার করবে। অথবা হয়ত চুক্তি স্বাক্ষরের পরে বুঝে ছিল এতে ওদের রাজনৈতিক ক্ষতি হবে, ফলে এখন অস্বীকার করতে হবে।

এর কয়েকদিন বাদে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করলেন, টাটার সাথে তাঁরা কথা বলবেন, যাতে সিঙ্গুরে কারখানার কাজ শুরু করে। নির্ধারিত দিনে টাটা এল এবং জানাল ন্যানো প্রকল্প তুলে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সিঙ্গুরের জমি ছাড়ছে না। হঠাৎ সিপিএম ও টাটা আলোচনা করে কেন এই সিদ্ধান্ত নিল, কি প্রয়োজন দেখা দিল, সেটা তাদের আগেকার চুক্তির মতই গোপন থেকে গেল। অবশ্য এর আগেই সংবাদপত্রে খবর বেরিয়েছে, আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে আলোচনা হয়েছে, রাজভবনের চুক্তি মেনে সিঙ্গুরে টাটা প্রকল্প হলে নন্দীগ্রামের পর সিঙ্গুরেও জনগণের এই বিজয়ে আগামী ভোটে সিপিএম বেকায়দায় পড়বে, আন্দোলনকারী বিরোধীপক্ষ লাভবান হবে এবং পশ্চিমবঙ্গের অন্যত্র নানা দাবিতে কৃষক-শ্রমিক ও গণআন্দোলনেরও জোয়ার বাড়বে, ফলে এতে অনেক ক্ষতি হবে। তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হবে, সিঙ্গুর থেকে যদি ন্যানো চলে যায়। তাহলে আন্দোলনকারীদের ঘাড়ে দায় চাপিয়ে এবং 'শিল্পবিরোধী' আখ্যা দিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করে ভোটে বাজিমাৎ করা যাবে এবং জনগণের মনোবল নষ্ট করে রাজ্যে আগামী দিনে আন্দোলনেও ভাটা সৃষ্টি করা যাবে। অতএব ন্যানো চলে যাক, আপাতত টাটার হাতেই সিঙ্গুরের জমি থাকুক। পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে। ফলে টাটাকে ডেকে এনে গোপনে কী আলোচনা করা হল, সেটা বোঝা কঠিন নয়। এছাড়াও একথা পরিষ্কার যে, বর্তমানে বিশ্বে ও এদেশে যে ভয়াবহ মন্দার সংকট চলছে, সকল শিল্পে এবং মোটর গাড়ির শিল্পেও যে বিপর্যয় এসেছে, ফোর্ড, জেনারেল মোটরস, মিৎসুবিশি সহ বিশ্বের সকল নামজাদা মোটর কোম্পানি ব্যাপক উৎপাদন সঙ্কোচন ও ছাঁটাইয়ের পথ নিয়েছে, টাটা মোটরসের শেয়ার কেউ কিনছে না, টাটা মোটরসের উৎপাদন ইতিমধ্যেই ৫০ শতাংশ কমানো হয়েছে, জামসেদপুরেই এই কারখানায় ২৩শে অক্টোবর ৪০০ জনকে ছাঁটাই করা হয়েছে — এ পরিস্থিতিতে এই মুহূর্তে টাটার ন্যানো গাড়ি বের করাও সম্ভব ছিল না। অথচ পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী এই বছরেই সিঙ্গুর থেকে ন্যানো বের করার কথা, এই কমিটমেন্ট থেকে বেরিয়ে যাবার সুযোগ রতন টাটার দরকার ছিল। ফলে সিপিএম নেতৃত্ব ও রতন টাটা উভয়ে পরস্পরের স্বার্থে একমত হয় যে, আন্দোলনকারীদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে সিঙ্গুর থেকে ন্যানো স্কীম আপাতত প্রত্যাহার করা হবে। পরে বাজার দেখে যেকোন জায়গা থেকে ন্যানো বের করা যাবে। ফলে দুই পক্ষের বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই প্রথমে রতন টাটা ও পরে শিল্পমন্ত্রী বক্তব্য রাখেন। লক্ষ্যণীয় উভয়ের বক্তব্য এবং সুরও প্রায় এক।

সিপিএমের ভূয়সী প্রশংসায় টাটা

টাটা তাঁর বক্তব্যে বারবার সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করলেন 'শিল্পবন্ধু' অর্থাৎ শিল্পপতিদের বন্ধু এই আখ্যা দিয়ে। দেওয়ারই কথা। মালিকরা যখন-তখন ছাঁটাই

করছে, ক্লোজার-লকআউট করছে, শ্রমিকের প্রাপ্য প্রভিডেন্ট ফান্ড আত্মসাৎ করছে, ওয়েজ কাট করছে, কনট্রাক্ট প্রথা চালু করছে তখন যে সিপিএমের মুখ্যমন্ত্রী দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিদের একান্ত অনুগত হয়ে বারবার ঘোষণা করে যাচ্ছেন, 'ধর্মঘট নয়, শিল্পে শান্তি রক্ষা কর', 'মালিক-শ্রমিক বন্ধুত্ব গড়ে তোল' এবং এমনকী 'টাটাদের কেশাগ্র স্পর্শ করতে দেব না,' সেই মুখ্যমন্ত্রীকে 'শিল্পবন্ধু' বলবেন না তো কাকে বলবেন রতন টাটা! টাটা একজন সস্তা রাজনীতিকের মত এই প্রশ্নও তুললেন যে আন্দোলনকারীরা কোথা থেকে টাকা পেয়েছে এবং কুৎসিত ইঙ্গিত করে পশ্চিমবঙ্গের যে ব্যাপক গরিব ও মধ্যবিত্ত জনগণ এই আন্দোলনের ফান্ডে চাঁদা দিয়েছেন, তাঁদেরও অপমান করলেন। রতন টাটা প্রেস কনফারেন্সে এমনভাবে বক্তব্য রেখেছেন, যাতে 'আগামী নির্বাচনে সিপিএমকে ভোট দিন', এই কথাটা বাদ দিয়ে বাকি সবই আছে। সম্প্রতি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে টাটা সেই বাকি কাজটাও সম্পূর্ণ করেছেন — পশ্চিমবঙ্গের যুবশক্তিকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে সিপিএমের পক্ষে দাঁড়াবার আহ্বান জানিয়েছেন। পুঁজিপতিরা তাদের পছন্দমত দলকে টাকা দেয়, মদত যোগায়, তাদের পক্ষে প্রচার চালায়, একথা সচেতন মানুষমাত্রই জানে, বোঝে। কিন্তু রতন টাটা এবার যেভাবে সিপিএমের পক্ষে এবং আন্দোলনের বিপক্ষে নগ্নভাবে নেমেছেন, এটা এদেশে কেউ কোনদিন দেখে নি। ফলে সিপিএম নেতারা নিজেদের ভাগ্যবান গণ্য করতে পারেন! আজ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি থেকে দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি সকলেই কংগ্রেস, বিজেপির মত সিপিএমকেও পরম বিশ্বস্ত ও শিল্পপতিদের বন্ধু বলেই পঞ্চমুখে প্রশংসা করে। তাদের প্রতিনিধিরা ঘন ঘন রাইটার্স বিল্ডিংয়ে, আলিমুদ্দিন স্ট্রীটে, ফাইভস্টার হোটেলে সিপিএম মন্ত্রী ও নেতাদের সাথে দহরম-মহরম ও শলাপরামর্শ করে। এভাবেই সিপিএম নেতৃত্ব তাদের বহুল প্রচারিত 'সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিরোধী জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী' রূপায়ণ করছে।

সিপিএম নেতাদের বন্ধু এই টাটার পুঁজি শুরুতে ফেঁপেছে চীন থেকে অবৈধ আফিং ব্যবসা চালিয়ে; তারপর জামশেদপুরের আদিবাসী শ্রমিকদের বেপরোয়া শোষণ করে, নিষ্পেষণ করে। এমনকী ১৯২৮ সালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে টাটার বিরুদ্ধে শ্রমিক আন্দোলন করতে হয় এবং টাটারা ভাড়াটে গুণ্ডা পর্যন্ত নিয়োগ করেছিল সুভাষচন্দ্র বসুকে খুন করার জন্য। ওড়িশায় চরম শোষিত অর্ধভুক্ত আদিবাসী শ্রমিকদের নিয়ে আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী দুই এস ইউ সি আই নেতা কমরেড মুসা পাত্র ও শ্যামাপদ রাউতকে টাটারা গুণ্ডা দিয়ে খুন করায়। সিপিএমের কল্যাণে সেই টাটাই হয়ে গেলেন 'খুবই সংবেদনশীল', 'লাভ করে, কিন্তু শ্রমিক শোষণ করে না।' এই 'সংবেদনশীল' ও 'কর্মসংস্থানে ব্যাগ্র' টাটাই কিন্তু জামসেদপুরে ইস্পাত কারখানায় শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা কমাতে কমাতে ৮৫০০০ থেকে ৪৪০০০, টেলকোতে ২২০০০ থেকে ৭০০০,

পুনেতে গাড়ি কারখানায় ৩৫০০০ থেকে ২১০০০ করেছে। টাটা ন্যানোর কারখানা করলেই রাজ্যে 'উন্নয়নের স্রোত' বয়ে যাবে বলে যারা হৈ চৈ করছিলেন, তাদের একবার পাশের রাজ্য ঝাড়খণ্ড বা পূর্বতন বিহারের চিত্র স্মরণ করানো দরকার। টাটার সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ কারখানা জামশেদপুরে অবস্থিত, যে বিশাল পুঁজির মালিক হয়ে টাটার এত দম্ভ, সেই পুঁজি তো সৃষ্টি করেছে বংশানুক্রমে ওখানকার ও বাইরের বেশ কয়েক লক্ষ শ্রমিক। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও পূর্বতন বিহার ও বর্তমান ঝাড়খন্ডের আর্থিক চেহারা কি? এমনকী খোদ জামশেদপুরের আশপাশের গ্রামগুলির অবস্থা কি, তারা তো যেই তিমিরে ছিল তার চেয়েও যে গভীর তিমিরে পড়ে ধুঁকছে।

তীব্র বাজার সংকটে জর্জরিত বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় যথার্থ শিল্পায়ন আজ আর সম্ভব নয়

সাথে সাথে এ কথাও বলা দরকার যে, হাতে গোনা ২/১টি শিল্প করার ঢাক পিটিয়ে একই সময়ে হাজার হাজার বন্ধ কারখানায় লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের কর্মহানি ঘটানোকে শিল্পায়ন বলে না। ইতিহাস ও অর্থনীতি শাস্ত্রসম্মত বিচারে শিল্পায়ন হচ্ছে, বাজার বা জনগণের চাহিদা যত ক্রমাগত বাড়ছে, তত তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে লাগাতার শিল্পের বিস্তার ঘটছে, যা ঘটেছিল অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকে পশ্চিমী দেশগুলিতে। তখন সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে বণিকী পুঁজি কুটিরের আবদ্ধ শিল্পকে মুক্ত করে বৃহৎ থেকে বৃহত্তর শিল্প গড়ার অভিযান শুরু করেছিল। পুঁজিবাদের জন্মলগ্নে সেই শিল্পবিপ্লবের যুগে শুধু কৃষির উৎপাদনবৃদ্ধির প্রয়োজনেই নয়, শিল্পের ক্রমবর্ধমান শ্রমশক্তির চাহিদাপূরণেও সামন্ততন্ত্রে শৃঙ্খলিত ভূমিদাসদেরও মুক্ত করতে হয়েছিল বিজ্ঞানের সাহায্যে কৃষিতে আধুনিকীকরণ ও যন্ত্রীকরণ ঘটিয়ে। সেই যুগ আজ অতীতের ইতিহাসের পাতায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মহান মার্কস মুনাফা ভিত্তিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে অনিবার্য সঙ্কটময় পরিণতি সম্পর্কে ওয়ার্নিং দিয়েছিলেন, সেটাই বারবার সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। পরবর্তীকালে মহান লেনিন দেখিয়েছিলেন, পুঁজিবাদ ঊনবিংশ শতাব্দির শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দির প্রথম ভাগে অবাধ-স্বাধীন প্রতিযোগীতার স্তর অতিক্রম করে একচেটিয়া পুঁজিতে উপনীত হয়ে শিল্পপুঁজি-ব্যাঙ্কপুঁজির মার্জার বা মিলন ঘটিয়ে লগ্নিপুঁজির জন্ম দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী স্তরে এসেছে এবং অনুন্নত দেশগুলির সস্তা মজুর ও কাঁচামালের বাজার লুণ্ঠনের ভাগাভাগি নিয়েই সাম্রাজ্যবাদী-সাম্রাজ্যবাদীতে যুদ্ধ অনিবার্য করছে। প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের বাজার সঙ্কটের ফলেই সৃষ্টি হয়েছিল। আজ সেই বুর্জোয়া বাজার অর্থনীতির বাজার সঙ্কট এমন তীব্র হয়েছে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী 'গ্রেট ডিপ্রেসন' বা মহামন্দার চেয়েও ভয়ঙ্কর সঙ্কটে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজিবাদী দুনিয়ায় ত্রাহি

ত্রাহি রব চলছে। ব্যাঙ্কিংয়ে, শেয়ার মার্কেটে, ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল সেক্টরে প্রতিদিনই ধস নামছে। বিশ্বপুঁজিবাদের শিরোমণি মার্কিন দেশে সম্প্রতি যে তীব্র ধস নেমেছে, তার ধাক্কায় সমগ্র পুঁজিবাদী দুনিয়াতেই টালমাটাল অবস্থা। দেশে দেশে হাজার হাজার কলকারখানা বন্ধ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ছাঁটাই হচ্ছে, সরকারি তহবিল থেকে হাজার হাজার কোটি ডলার সাহায্য দিয়ে, সুদের হার কমিয়ে, মানি সার্কুলেশন বাড়িয়ে ও এরকম হরেকরকম দাওয়াই দিয়েও বুর্জোয়া অর্থনীতিবিদ ও রাষ্ট্রনায়করা অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে পারছে না এবং পারবেও না। বরং ব্যাঙ্কগুলিকে বাঁচাবার জন্য বিভিন্ন দেশের সরকার যে এত অর্থ ঢালছে, শিল্পগুলির এত ঋণ মকুব করছে তার ফলে জনগণের উপর ট্যাক্সের বোঝা ও মূল্যবৃদ্ধির চাপ আরও বাড়বে, ইনফ্লেশন বা মুদ্রাস্ফীতি আরও তীব্র হবে, শিক্ষা-স্বাস্থ্য ও অন্যান্য খাতে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ আরও কমানো হবে। আর অর্থনীতির গ্রোথ যদি কিছু হয়ও তা এতই সাময়িক ও যৎসামান্য যে ওরাই পুঁজিবাদী অর্থনীতির নাম দিয়েছে 'বাবল ইকনমি', অর্থাৎ বুদবুদের মত খানিক ফুলেই ফেটে যায়। বিশ্বপুঁজিবাদী অর্থনীতিতে সম্প্রতি যে ভয়াবহ মন্দার সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে, তাতে ইতিমধ্যে এই কদিনেই এপর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে ২ কোটি এবং ভারতে ১০ লক্ষ শ্রমিক কর্মচ্যুত হতে চলেছে। এদেশের তথ্যপ্রযুক্তি, আবাসন, পরিকাঠামো, পরিষেবা ক্ষেত্রগুলি, যেগুলি নিয়ে খুবই হৈচৈ চলছিল সেই গুলিতেই সবচেয়ে আগে লালবাতি জ্বলতে চলেছে। এই যখন পুঁজিবাদী অর্থনীতির অবস্থা, বাজার সংকট যখন সমগ্র বিশ্বে শিল্পের ধ্বংসসাধন করছে, তখন আমাদের দেশে ও এ রাজ্যে কংগ্রেস, বিজেপি, সিপিএম নেতারা 'শিল্পায়ন শিল্পায়ন' বলে যে ধূয়া তুলেছে, সেটা কি লোকঠকানো মিথ্যাচার নয়?

বর্তমান অনিশ্চিত সংকট পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই অনিবার্য পরিণতি

আজ যথার্থ শিল্পায়ন একমাত্র সম্ভব পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দ্বারা, যেমন ঘটেছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে। পুঁজিবাদী অর্থনীতির নিয়মে উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে ক্রমাগত ম্যাক্সিমাম মুনাফা অর্জন। তার জন্য প্রয়োজন শ্রমিককে ম্যক্সিমাম শোষণ করা। কারণ একমাত্র শ্রমিককে তার প্রাপ্য ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত করেই পুঁজিপতিরা লাভ করে যেটা মার্কস ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে গেছেন। এখানে বিজ্ঞানসহ প্রযুক্তিকে লাগানো হয় শ্রমিক কমিয়ে বেশি লাভের স্বার্থে। আর ন্যায্য প্রাপ্যবঞ্চিত শ্রমিক জনগণই বাজারের অধিকাংশ ক্রেতা, এছাড়া বাজারে পুঁজিবাদ সৃষ্ট ছাঁটাই শ্রমিক সহ বিপুল সংখ্যক বেকার-অর্ধবেকার তো থাকেই। এর ফলেই পুঁজিবাদী বাজার অর্থনীতিতে 'চাহিদার সংকট' তথা বাজারসংকট অনিবার্যভাবেই সৃষ্টি হচ্ছে, তীব্রতর হচ্ছে। যুদ্ধের উত্তেজনা সৃষ্টি করে সামরিক শিল্প গড়ে তোলা, অস্ত্রের ব্যবসা করা, মাঝে মাঝে যুদ্ধ বাধানো ও পরদেশ আক্রমণ করা, একচেটিয়া ও বহুজাতিক

পুঁজিপতিদের বাড়তি বা অলস পুঁজিকে শেয়ার মার্কেটের ফাটকাবাজিতে, সুদের কারবারে, রিয়েল এস্টেট বা গৃহনির্মাণ ব্যবসায়, সার্ভিস সেক্টরে, খুচরো ব্যবসায় এবং এমনকি কৃষিপণ্যের খুচরো ব্যবসায় লাগিয়ে, ব্যাপক ডাউনসাইজিং ও রিট্রেঞ্চমেন্ট ইত্যাদি করেও আজ পুঁজিবাদ পরিত্রাণ পাচ্ছে না। ঝানু বুর্জোয়া অর্থনৈতিক বিশারদরা যত 'অব্যর্থ' দাওয়াই দিচ্ছে, ততই রুগীর অন্তিম দশা আসছে। অন্যদিকে যেহেতু সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির নিয়মে উৎপাদনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে, ক্রমাগত জনগণের ম্যাক্সিমাম অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক চাহিদা পূরণ, সকলের কর্মসংস্থান ঘটানো, বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে শ্রমিকের কাজের সময় কমিয়ে সাংস্কৃতিক জীবনের বিকাশ ঘটানো, ফলে সেখানে বাজারসঙ্কট ত দূরের কথা, চাহিদার বাজার ক্রমাগত সম্প্রসারিত হয়। ফলে শিল্পায়নও অবাধে ঘটতে থাকে, যেমন পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নে ঘটেছিল, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পূর্বে যে রাশিয়ায় শিল্পের অবস্থা প্রায় ১৯১০-১৫ সালের ব্রিটিশ ভারতের মত ছিল, সেই দেশই বিপ্লবের পর শিল্পে এত অসাধারণ অগ্রগতি ঘটিয়েছিল যে এমনকি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির পরও যুদ্ধে অক্ষত থাকা উন্নত মার্কিন অর্থনীতিকেও বহুক্ষেত্রে পেছনে ফেলে দিয়েছিল। এজন্যই বিগত শতাব্দীর ত্রিশের দশকের বিশ্বসাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের ভিত কাঁপানো 'গ্রেট ডিপ্রেসান' সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দৃঢ়ভিত্তিকে এতটুকু নাড়াতে পারেনি। ফলে এ রাজ্যে, এদেশে ও সমগ্র বিশ্বে আজ শিল্পায়ন ঘটানো একমাত্র সম্ভব পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিবর্তে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি কায়েম করেই।

মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করে কোন প্রগতিশীল এবং গণআন্দোলনকে সফল পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া যায় হয় না

মনে রাখতে হবে, আমাদের দেশে, এ রাজ্যে ও সমগ্র বিশ্বে সকল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সঙ্কটের মূল কারণ শোষণমূলক পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থা। মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই একমাত্র এইসব সঙ্কটের হাত থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। সিপিএমকে দেখে যারা মার্কসবাদকে ভুল বুঝছেন, তারা শুধু ভুল করছেন তাই নয়, তারা না জেনে হলেও জনগণেরই ক্ষতি করছেন। কারণ মার্কসবাদের বিরুদ্ধতা করে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লব তো সফল করা যায়ই না, এমনকী গণআন্দোলনগুলিকেও সফল পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় না।

মনে রাখতে হবে, কোন ব্যক্তি বিশেষের ইচ্ছায় নয়, ইতিহাসের প্রয়োজনেই ও নিয়মেই মার্কসবাদ এসেছে, যেমন এসেছিল সুদূর অতীতে দাসপ্রথার যুগে সামাজিক কল্যাণে অধ্যাত্মবাদ বা ধর্মীয় চিন্তা, আবার রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের যুগে এই

অধ্যাত্মবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেই এসেছিল জাতীয়তাবাদ, সেক্যুলার মানবতাবাদ ও পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি সংগ্রামী বুর্জোয়া শ্রেণীর নেতৃত্বে, তেমনি সঙ্কটগ্রস্ত পুঁজিবাদের হাত থেকে মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই এসেছে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন মার্কসবাদ, বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের আদর্শ, শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তিসংগ্রামের পথে। বিংশ শতাব্দীতে এই মার্কসবাদকে হাতিয়ার করেই ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ১৯৪৫ সালে ফ্যাসিস্ট শক্তির পরাজয়, ১৯৪৯ সালে চীনে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের জয়, ১৯৭১ সালে ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রামের সাফল্য, বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন, শান্তি আন্দোলন, শ্রমিকশ্রেণী ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বার জয়যাত্রা সংগঠিত হয়েছিল। যার জন্য অমার্কসবাদী হয়েও মনীষী রঁমা রলাঁ, বার্নাড শ, আইনস্টাইন সহ এদেশের নেতাজী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতারা এবং রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুল, প্রেমচন্দরা সমাজতন্ত্র ও মার্কসবাদ সম্পর্কে গভীর শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মতভেদ প্রকাশ করতে গিয়েও মার্কসবাদ সম্পর্কে কোন কটূক্তি করার কথা ভাবতে পারেন নি, যা আজকাল একদল সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের কাছে বিক্রি হয়ে যাওয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট বুদ্ধিজীবী অহরহ করে থাকেন। চিকিৎসা বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগে বা ভ্রান্ত প্রয়োগে রোগী মারা গেলে যেমন চিকিৎসা বিজ্ঞানকে দায়ী করা চলে না, তেমনি লেনিন-স্ট্যালিন-মাও সে তুঙ পরবর্তী অধ্যায়ে সমাজতন্ত্রের ধ্বংস হওয়ায় মার্কসবাদ ব্যর্থ এটা প্রমাণ হয় না। এছাড়াও ইতিহাসের শিক্ষা হচ্ছে, যে কোন নতুন আদর্শ, নতুন সমাজব্যবস্থা চূড়ান্ত বিজয় হতে বহু সময় এমনকী কয়েক শত বছরও লেগে যায়, বহু পরাজয় - পরাজয়, তারপর জয়, আবার পরাজয়, এইসব স্তর অতিক্রম করতে হয়। ধর্মীয় আদর্শ ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী আদর্শ শ্রেণীশোষণ মুক্ত সমাজের চিন্তা আনতে পারেনি, একধরনের শোষণের পরিবর্তে আর এক ধরনের শোষণ অর্থাৎ দাসপ্রথার পরিবর্তে রাজতন্ত্র, রাজতন্ত্রের পরিবর্তে বুর্জোয়া প্রজাতন্ত্র এনেছে। কিন্তু বৌদ্ধ, হিন্দু, খ্রিস্টান, ইসলাম ইত্যাদি ধর্ম চূড়ান্ত জয়লাভ করতে কয়েক শত বছর লেগেছে, কত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছে। রেনেশাঁস থেকে শুরু করলে পার্লামেন্টারি ডেমোক্র্যাসি প্রতিষ্ঠা করতে প্রায় ৩৫০-৪০০ বছর লেগে গিয়েছে। এমনকী বিখ্যাত ফরাসি বিপ্লবের পরও আবার নেপোলিয়ানের মাধ্যমে রাজতন্ত্র ফিরে এসেছিল। এই অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কয়েক হাজার বছর ধরে দাসপ্রথা, রাজতন্ত্র, পুঁজিবাদে চলতে থাকা শ্রেণীশোষণ উচ্ছেদ করে ইতিহাসে প্রথম শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে হয়েছে। ফলে ৮০-৯০ বছরের ইতিহাস দেখে মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্র ব্যর্থ এই সিদ্ধান্তে আসা চূড়ান্ত ভ্রান্ত বিচার হবে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পরবর্তী অধ্যায়ে মার্কসবাদী বিজ্ঞানকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে না পারলে আবার

যে পুঁজিবাদ পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে, এই আশঙ্কা মহান মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ, শিবদাস ঘোষ— এঁরা সকলেই বারবার ব্যক্ত করেছেন। আর মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখার কী ভয়ঙ্কর পরিণতি অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনে দেখা যাচ্ছে! এর চেয়ে মানবসভ্যতার আর কী দুর্দশা ঘটতে পারে! এটা কি চলতে দেওয়া যায়। তাই মার্কসবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেতা করার দ্বারা শোষিত-অত্যাচারিত জনগণের ক্ষতিসাধনই হবে, আর লাভবান হবে অত্যাচারী শোষকশ্রেণী — সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদ।

একটু বিচার করলেই বোঝা যাবে যে, পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে গান্ধীবাদী কংগ্রেস ও হিন্দুত্ববাদী বিজেপি যা করছে, মার্কসবাদের তক্‌মা লাগিয়ে সিপিএমও তাই করছে। বহু দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতায় একটা খাঁটি কথা সমাজে চালু আছে, 'গেরুয়া পরলেই সন্ন্যাসী হয় না, মক্কা গেলেই হাজি হয় না, খদ্দর পরলেই স্বদেশী হয়না'। তেমনি মহান লেনিনও একদিন বলেছিলেন, 'মার্কসবাদ জিন্দাবাদ বললে, আর হাতে লাল ঝান্ডা নিলেই মার্কসবাদী হয় না, চরিত্র খাঁটি কিনা যাচাই করতে হয়।'

সিপিএম কোনদিনই মার্কসবাদী দল ছিলনা

১৯৪৮ সালেই অবিভক্ত সিপিআইয়ের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এবং পুনরায় ১৯৬৪ সালে সিপিআই ভেঙে সিপিএমের গঠন পর্বে এস ইউ সি আইয়ের প্রতিষ্ঠাতা মহান মার্কসবাদী চিন্তানায়ক কমরেড শিবদাস ঘোষ বলেছিলেন, এই দলের নেতারা প্রথমদিকে সৎ ও আন্তরিক হওয়া সত্ত্বেও দল গঠনে লেনিনীয় বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি অনুসরণ না করায়, এদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী মার্কসবাদকে বিশেষরূপে প্রয়োগ করে বিশেষীকৃত করতে ব্যর্থ হওয়ায় এবং তার ফলে জীবনের সবদিক ব্যাপ্ত করে মার্কসবাদকে জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করতে না পারায়, ধর্মীয় ও বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিবর্তে সর্বহারা বিপ্লবীদের অনুসরণীয় সর্বহারা সংস্কৃতি নিরূপণ করতে সক্ষম না হওয়ায়, দলের মধ্যে সর্বহারা যৌথ নেতৃত্ব ও যৌথ নেতৃত্বের বিশেষীকৃত রূপের পরিবর্তে বুর্জোয়া ব্যক্তিবাদী আমলাতান্ত্রিক নেতৃত্ব কায়েম হওয়ায়, সর্বহারা গণতন্ত্র ও সর্বহারা সংস্কৃতিজাত গণতান্ত্রিক একেন্দ্রীকরণের পরিবর্তে বুর্জোয়া যান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ দলের মধ্যে চালু হওয়ায় প্রথম থেকেই অবিভক্ত সিপিআই এবং পরে সিপিএম যথার্থ মার্কসবাদী দল হিসাবে গড়েই উঠতে পারে নি। এছাড়া রণনীতি ও রণকৌশলগত বিচ্যুতি তো আছেই।

মহান মার্কস-এঙ্গেলস প্রতিষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের অন্তর্ভুক্ত একদা মার্কসবাদী বলে পরিগণিত সোস্যাল ডেমোক্র্যাট পার্টিগুলির অধঃপতন লক্ষ্য করে লেনিন বলেছিলেন, এরা শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রামকে বৈপ্লবিক লক্ষ্যে পরিচালিত না করে

অর্থনৈতিক সুবিধাবাদ ও পার্লামেন্টারি সংস্কারবাদের লক্ষ্যে পরিচালিত করছে, এরা পুঁজির সাথে শ্রমের আপসের শক্তি, এরা মার্কসবাদের বিপ্লবী প্রাণসত্তাকে হত্যা করে ও তাকে বিকৃত করে বুর্জোয়াশ্রেণীর পক্ষে মার্কসবাদকে গ্রহণযোগ্য করছে, এরা শ্রমিক আন্দোলনে বুর্জোয়াদের এজেন্ট। এজন্যই মহান স্ট্যালিন বলেছিলেন, 'আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে সোস্যাল ডেমোক্র্যাসিকে পর্যুদস্ত না করতে পারলে পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করা যাবে না।' লেনিন সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের এজেন্ট দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন তো করেইছিলেন, রাশিয়াতেও মার্কসবাদী বলে পরিচিত রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সাথে বিচ্ছেদ ঘটিয়ে, এমনকী তাঁর প্রথম জীবনের মার্কসবাদী শিক্ষক প্লেখানভের বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম চালিয়ে সঠিক পদ্ধতিতে বলশেভিক পার্টি গড়ে তুলে বিপ্লব সফল করেছিলেন। সিপিআই ও সিপিএম গত শতকের পাঁচ ও ছয়ের দশকে যতটুকু বামপন্থার চর্চা করত, '৬৭ ও '৬৯ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার থাকাকালীন এস ইউ সি আইয়ের ভূমিকার জন্য 'ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ হবে না' এই নীতি যতটা মানতে বাধ্য হয়েছিল, '৭৭ সাল থেকে সরকারি গদীতে বসবার পর এসবই জলাঞ্জলি দিয়ে বুর্জোয়া কংগ্রেস ও বিজেপি দলের মতো পুরোপুরি দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে কাজ করে চলেছে। এরাজ্যে সরকারি গদীতে বসে সিপিএম এখন আর নিছক পুঁজি ও শ্রমের মধ্যে শুধু আপস করা নয়, পুঁজির স্বার্থে শ্রমিক আন্দোলনকে ধ্বংস করছে। ফলে অধঃপতনে সিপিএম লেনিন ধিক্কৃত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককেও ছাড়িয়ে গেছে। ইংল্যান্ডে ব্রিটিশ লেবার পার্টি যেমন সাম্রাজ্যবাদীদের হয়ে কাজ করছে 'শ্রমিক দলের' নাম নিয়ে, এরাও তেমনি মার্কসবাদের ছাপ লাগিয়ে পুঁজিপতিদের হয়ে কাজ করছে। ঠিক এভাবেই 'মার্কসবাদ জিন্দাবাদ' করতে করতেই রাশিয়ায় ক্রুশ্চেভ-ব্রেজনেভ-গর্বাচভরা ও চীনে দেং শিয়াও পিংরা সমাজতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে। সিপিএমের বহু সৎ কর্মী-সমর্থক দলের এই শোচনীয় পরিণতি দেখে বেদনায় ছটফট করছেন। কিন্তু এই সর্বনাশ ঘটতে পারল কেন?

শোষকশ্রেণী কোন্ দলগুলির প্রচার দেয়, কোন্ দলের দেয় না

কারণ তারা অতীতে সিপিএমের পেছনে ছুটেছেন মার্কসবাদের লেবেল দেখে, দলে লোকজনের ভিড় দেখে, সংবাদপত্রের প্রচার দেখে — দলের নীতি-আদর্শ, শ্রেণীচরিত্র বিচার করে নয়। একথাও মনে রাখা দরকার, মালিকশ্রেণী নিয়ন্ত্রিত প্রচারমাধ্যম কখনও যথার্থ বিপ্লবীদের প্রচার দেয় না। যেমন মার্কস,এঙ্গেলস, লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে-তুঙ-শিবদাস ঘোষকে দেয়নি। আমাদের দেশে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ও সংবাদপত্রগুলি তৎকালীন বিপ্লবীদের কাজকর্মের খবর, নেতাজী সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য ও খবরাখবর জনগণকে জানতে দেয় নি, অথচ খুবই প্রচার দিয়েছে দক্ষিণপন্থী

গান্ধীবাদীদের। এস ইউ সি আই এত আন্দোলন করছে, কত বড় বড় মিটিং-মিছিল করছে, কাগজে-টিভিতে তার খবর থাকে না। অনেকে অবাক হয়ে ভাবে, কেন এমন ঘটছে, চোখের সামনে এস ইউ সি আইকে দেখছে, কীভাবে মার খেয়েও লড়ছে, অথচ কোন খবরই নেই। এটা জানা দরকার পৃথিবীতে কোনও মহৎ আন্দোলন, কোনও বিপ্লবী সংগ্রাম প্রথমে বহু লোক নিয়ে শুরু হয় না, অতি স্বল্পসংখ্যকই প্রথম সূচনা করে, শোষকশ্রেণীর প্রচারযন্ত্র প্রচারও দেয় না, বরং ভয় পায়। তাই লোকের ভিড় ও সংবাদমাধ্যমের প্রচার দেখে দল বা নেতৃত্ব চিনতে গেলে ঠকতে হয়, যেমন ঠকেছে সিপিএমের অসংখ্য কর্মী-সমর্থকরা, ঠকেছে রাজ্যের জনগণও। তারাও অতীতে সিপিএম সম্পর্কে কোন সমালোচনাই শুনতে চাইত না, তখন একটাই কথা ছিল 'এখন কোন কথা নয়, কংগ্রেসকে হারাতে হলে সিপিএমকে চাই'। এখন তাদের পস্তাতে হচ্ছে। আবার বর্তমানে একইভাবে আওয়াজ উঠছে, 'সিপিএম-কে হারাতে হবে, কংগ্রেস-তৃণমূল-বিজেপিকে নিয়ে মহাজোট চাই'। সংবাদমাধ্যমগুলো সুকৌশলে এই প্রচার তুলছে, জনগণও বিভ্রান্ত হচ্ছে। জনগণকে একথা ভুললে চলবে না, সিপিএম এরাজ্যে যা করছে, একই কাজ কংগ্রেস এবং বিজেপিও করছে অন্য রাজ্যগুলিতে দেশিবিদেশি পুঁজিপতিদের স্বার্থে। এটাই স্বাভাবিক। কারণ শোষক-শোষিতে, মালিক-শ্রমিকে শ্রেণীবিভক্ত এই সমাজে রাজনীতি ও দল শ্রেণীস্বার্থেই পরিচালিত হয়। কংগ্রেস, বিজেপি দল এবং বর্তমানে গদির লোভে সিপিএম দেশি-বিদেশি পুঁজিপতিশ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হচ্ছে। পুঁজিপতিরা যেমন ইন্ডাস্ট্রিয়াল বা বিজনেস ম্যানেজার নিযুক্ত করে, তেমনি সরকার চালাবার জন্য এই দলগুলিকে কেন্দ্রে ও রাজ্যে রাজ্যে পলিটিক্যাল ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ করে। প্রয়োজনে একবার একে, পরেরবার ওকে বসায়, যোগ্যতা দেখে বারবার পুনর্নিয়োগ ও প্রমোশনও দেয়। এই দলগুলিও কীভাবে মনিবকে তুষ্ট করে অনুগ্রহ পেতে পারে একে অপরের সাথে কম্পিট করে। সেজন্য এই অবস্থায় খবরের কাগজের ও টিভি-র প্রচারের জৌলুসে নয়, লোকের ভিড় দেখে নয়, মন্ত্রীত্বের ক্ষমতা ও এমএলএ-এমপি-র সংখ্যা দেখেও নয়, দল ও নেতৃত্ব গ্রহণ করতে হবে নীতি-আদর্শ-সংস্কৃতি বিচার করে, উন্নত রাজনৈতিক চেতনার আলোকে, না হলে বারবার ঠকতে হবে।

কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় এস ইউ সি আই জন্মলগ্ন থেকে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামের পতাকা বহন করেছে

সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষ প্রতিষ্ঠিত এস ইউ সি আই জন্মলগ্ন থেকেই পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্য নিয়ে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রামের পতাকা বহন করে যাচ্ছে। পাঁচ-ছয়ের দশকে যুক্ত আন্দোলনে সিপিআই-

সিপিএমের ভোটসর্বস্ব সংস্কারবাদী লাইন এবং এস ইউ সি আইয়ের বৈপ্লবিক লাইনের মধ্যে তীব্র দ্বন্দ্ব-সংঘাত হয়েছে, ১৯৬৭ সালে এস ইউ সি আইয়ের চাপেই সিপিএম ও অন্যেরা ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল, 'যুক্তফ্রন্ট সরকার ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশি হস্তক্ষেপ করবে না'। যার ফলে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের গণআন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, আওয়াজ উঠেছিল, 'যুক্তফ্রন্ট সরকার গণআন্দোলনের হাতিয়ার'। তখনও আতঙ্কিত টাটা-বিড়লারা ও সংবাদপত্রগুলো 'গেল গেল' রব তুলেছিল, এস ইউ সি আইকে শ্রম দপ্তর থেকে সরিয়ে দেবার দাবি তুলেছিল। সেটাই করা হয়েছিল '৬৯ সালের দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠনে। কিন্তু সিপিএমের ষড়যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও এস ইউ সি আই মন্ত্রীসভায় থেকে যাওয়ার ফলে দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পর্কে '৬৭ সালের ঘোষিত নীতি পুরোপুরি বিসর্জন দিতে পারেনি। কিন্তু সেই কাজটাই '৭৭ সালে ক্ষমতায় এসে সিপিএম করল, যার জন্য সিপিএমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ভোটের আগে বেতার ভাষণে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, 'বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এলে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সময়ের মতো আন্দোলন-অশান্তি হবে না, কারণ এবার এস ইউ সি আই আমাদের সঙ্গে নেই।' শ্রমিকশ্রেণীর সংগ্রাম ও গণআন্দোলনের একমাত্র সংগ্রামী দল এস ইউ সি আই-কে বাদ দিয়েই তারা সেদিন পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের আস্থা অর্জন করে ক্ষমতায় বসেছিল। দেশিয় একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজির প্রতি এই আশ্বাস সিপিএম নেতৃত্ব অক্ষরে অক্ষরে রক্ষা করে যাচ্ছে বামপন্থাকে পদদলিত করে। অপরদিকে ১৯৭৭ সাল থেকেই মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে সাধারণ সম্পাদক কমরেড নীহার মুখার্জীর নেতৃত্বে এস ইউ সি আই এককভাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সকল জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে লাগাতার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত-ছাত্র-যুবক-মহিলাদের নানা দাবিতে গণআন্দোলন ও শ্রেণীসংগ্রাম করে গেছে। কলকাতা সহ রাজ্যের নানা শহরে, গ্রামে গ্রামে হাজার হাজার দলের কর্মী পুলিশের লাঠি-গুলি-টিয়ার গ্যাসে আক্রান্ত হয়ে বুকের রক্ত ঢেলে, নিহত আহত হয়ে লড়াই করে চলেছে। পুলিশ ও সিপিএমের ঘাতকবাহিনীর আক্রমণে এ পর্যন্ত দলের ১৫১ জন নেতা-কর্মী খুন হয়েছেন, ৪৯ জন নেতা-কর্মী মিথ্যা মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছেন, আরও ১০৮ জনের বিরুদ্ধে সাজানো মার্ডার কেস ঝুলছে। আজ পর্যন্ত এদেশে ও এরাজ্যে কোনও দলের এত ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। কিন্তু তা সত্ত্বেও কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষায় এস ইউ সি আই দলের কর্মীরা উন্নত নৈতিক বলে বলীয়ান হয়ে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই সব লড়াইয়ের ফলেই প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি শিক্ষা পুনঃপ্রবর্তন সহ রাজ্য, জেলা ও আঞ্চলিক স্তরে আরও বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দাবিও অর্জিত হয়েছে। এভাবেই ১৯৭৭ সাল থেকে এস ইউ সি আইয়ের উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গে পুনরায় প্রতিবাদী কণ্ঠ ও

গণআন্দোলনের পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং মার্কসবাদ ও বামপন্থার মর্যাদা অনেকটা রক্ষা করা গেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারায় পরিচালিত হয়ে এস ইউ সি আই দলের কর্মীরা যেরকম বলিষ্ঠভাবে সর্বস্ব পণ করে শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের স্বার্থে একটার পর একটা ছোট-বড় আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে, দলের কর্মীরা যে সততা, নিষ্ঠা, উন্নত চরিত্র, শৃঙ্খলা, ভদ্রতা ও শালীনতার পরিচয় দিয়ে যাচ্ছে, তাতে সংবাদমাধ্যমগুলি এস ইউ সি আই-এর খবর বয়কট করলেও সমগ্র রাজ্যের ঘরে ঘরে, রাজ্যের বাইরেও ব্যাপক মানুষের অন্তরে গরিবের লড়াইয়ের নির্ভরযোগ্য শক্তি হিসাবে এস ইউ সি আই শ্রদ্ধার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছে।

এস ইউ সি আই, তৃণমূল কংগ্রেসের আন্দোলনের ঐক্যে শাসকশ্রেণী আতঙ্কিত

১৯৯৮ সালে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস গড়ে ওঠে এবং এই দলও পার্লামেন্টারি রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে নানা ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ও আন্দোলন করতে থাকে। এস ইউ সি আই এবং তৃণমূল কংগ্রেস এই দুই দলের আন্দোলন পাশাপাশি চলতে থাকে। এরপর ২০০৬ সালে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রামে গণআন্দোলনে লোকাল স্তরে আন্দোলনের স্বার্থে ও জনগণের আকাংখায় তৃণমূল কংগ্রেস ও এস ইউ সি আইয়ের ঐক্য গড়ে ওঠে। নন্দীগ্রামে ১৪ মার্চ ও ১০ নভেম্বর সিপিএম সরকারের ফ্যাসিবাদি বর্বর আক্রমণের নৃশংসতা প্রত্যক্ষ করে এবং সিপিএমের এই ফ্যাসিবাদী আক্রমণাত্মক নীতি আগামী দিনে সকল গণআন্দোলনের পক্ষে ঘোরতর বিপদ গণ্য করে আমরা গণআন্দোলনের স্বার্থেই তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে রাজ্যস্তরে ঐক্য গড়ে তুলি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ইতিপূর্বে ভোটের সময় প্রথমে সিপিএম ও পরে তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে ঐক্যের প্রস্তাব আসা সত্ত্বেও আমরা সম্মত হইনি। কারণ, এস ইউ সি আই ভোটসর্বস্ব রাজনীতির চর্চা করে না, একমাত্র গণআন্দোলনের স্বার্থেই ঐক্যবদ্ধ হয় এবং গণআন্দোলনের প্রয়োজনে নির্বাচনেও ঐক্যবদ্ধভাবে লড়ে। তৃণমূল কংগ্রেসের সাথে এস ইউ সি আইয়ের এই বোঝাপড়ায় ঠিক হয়, (১) রাজ্য ও কেন্দ্র সরকারের সাম্রাজ্যবাদ-পুঁজিবাদের স্বার্থে রচিত সকল জনবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপের বিরুদ্ধে গণকমিটি গঠন করে গণআন্দোলন গড়ে তোলা হবে, (২) মার্কসবাদ ও বামপন্থাকে আক্রমণ করা হবে না, (৩) কংগ্রেস ও বিজেপি থেকে সমদূরত্ব রক্ষা করা হবে। একথা অনস্বীকার্য, তৃণমূলের সাথে এস ইউ সি আই-এর এই ঐক্য পশ্চিমবঙ্গের গণআন্দোলনে তীব্র জোয়ার সৃষ্টি করেছে। ফলে এই ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনকে শাসকশ্রেণী আতঙ্কের চোখে দেখছে। কারণ এই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের শক্তি তারা নন্দীগ্রামে দেখেছে, এবার সিঙ্গুরেও প্রত্যক্ষ করেছে। ফলে কংগ্রেস ও বিজেপি ষড়যন্ত্র

করছে পুরানো সম্পর্কের জের ধরে নির্বাচনী জালে তৃণমূল কংগ্রেসকে ফাঁসিয়ে যদি তৃণমূল কংগ্রেস-এস ইউ সি আই ঐক্য ভেঙে দেওয়া যায়। সর্বভারতীয় বুর্জোয়া দল কংগ্রেস ও বিজেপি অত্যন্ত ধুরন্ধর। যেসব রাজ্যে তারা সরকার চালায় সেখানে দু'টি দলই সিপিএমের মতই কৃষকদের জমি দেশি-বিদেশি পুঁজির স্বার্থে ধ্বংস করছে, পশ্চিমবঙ্গে ভোটের দিকে তাকিয়ে আগাগোড়া আন্দোলনে 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি' গোছের ভূমিকা নিয়ে রাজ্য সরকারকে বাস্তবে সাহায্যই করেছে। সর্বশেষ সর্বদলীয় বৈঠকে বিজেপি রাজ্য সরকারকে সমর্থন করেছে, কংগ্রেস সমর্থন করবে কথা দিয়েও শেষ মুহূর্তে ভোটের স্বার্থে পিছিয়ে এসেছে। পুঁজিপতিদের পক্ষ থেকে রতন টাটাও তৃণমূল নেত্রী মমতা ব্যানার্জীকে তীব্রভাবে আক্রমণ করছে যাতে এই ঐক্য ভেঙে তিনি আন্দোলনের পথ থেকে সরে আসেন। আর বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদি তো সরাসরি উপদেশ দিয়েছেন, ''অতি বামপন্থী না হয়ে দক্ষিণপন্থী পথে পশ্চিমবঙ্গকে পথ দেখাবার।'' ফলে পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী জনগণকে কংগ্রেস ও বিজেপির এই ষড়যন্ত্র সম্পর্কে খুবই সতর্ক থাকতে হবে।

নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুর আন্দোলনের শিক্ষাগুলি মনে রাখতে হবে

বহু গরিব মানুষের রক্ত ও প্রাণের বিনিময়ে নন্দীগ্রামে ও সিঙ্গুরে ঐতিহাসিক জয় অর্জিত হয়েছে। মধ্যযুগে ছিল 'জোর যার মুল্লুক তার', সৈন্যসামন্ত-পাইক বরকন্দাজ নিয়ে হানাদারি চালিয়ে লোকজনকে মেরেধরে তাড়িয়ে জমিদাররা এলাকা দখল করে নিত, প্রভুর হুকুম প্রজাদের মানতে হত, আইন-কানুনের কোন বালাই ছিল না। পরবর্তীকালে সাম্রাজ্যবাদীরা একইভাবে পরদেশ দখল করে তাদের প্রয়োজনেই আইন-আদালত সৃষ্টি করে শোষণ-লুণ্ঠন চালিয়েছে। আজ দেশীয় পুঁজিপতিশ্রেণী তাদের শ্রেণীস্বার্থে সংবিধান, আইন আদালত সৃষ্টি করে শহরের শ্রমিকদের উপর যেমন নির্মম শোষণ চালাচ্ছে, গ্রামাঞ্চলেও গরিব মানুষদের কৃষিজমি-ঘরবাড়ি ধ্বংস করে পথের ভিখারি বানাচ্ছে। এই বর্বর আক্রমণের বিরুদ্ধে কীভাবে লড়তে হয়, এই হামলা কীভাবে প্রতিরোধ করতে হয়, নিজেদের স্বার্থ ও ঘরবাড়ি-জমি কীভাবে রক্ষা করতে হয়, সেটা দেখিয়ে দিয়েছে নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুরের ঐতিহাসিক সংগ্রাম। এই সংগ্রাম থেকে শিক্ষা নিয়েই ভারতবর্ষের দিকে দিকে কৃষিজমি দখলের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছে। কৃষকদের প্রতিবাদেই মহারাষ্ট্রের সরকার আম্বানীদের কৃষিজমি দেওয়ার স্কীম বাতিল করতে বাধ্য হয়ে ঘোষণা করেছে কৃষকদের অনুমতি না নিয়ে রাজ্যের কোথাও কৃষিজমি নেওয়া হবে না। কোন রাজ্য সরকারই আর উর্বর কৃষিজমি দখল করতে সাহস করছে না। আন্দোলনের চাপেই এ রাজ্যের সিপিএমকেও বলতে হচ্ছে, 'নন্দীগ্রামে ও সিঙ্গুরে জনমত তৈরি না করে জবরদস্তি করতে গিয়ে তারা ভুল করেছে'। ফলে

নন্দীগ্রাম ও সিঙ্গুর আন্দোলনের জয় শুধু ঐ এলাকাতেই নয়, সমগ্র রাজ্যে এবং গোটা দেশের, এমনকী দেশের বাইরেও বিরাট প্রভাব ফেলেছে। কর্ণাটকে টাটা জমির ক্ষতিপূরণ ও চাকরির প্রতিশ্রুতি পালন না করায় চাষীদের নিয়ে এস ইউ সি আই লড়াই করে টাটাকে ঠেকিয়ে রেখেছে। অন্ধ্রে কৃষকদের বিক্ষোভে টাটা পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। উত্তরখণ্ড ও গোয়া হতে শুরু করে দেশের সর্বত্র বিক্ষোভ গড়ে উঠেছে। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের গরিব কৃষক-বর্গাদার-ক্ষেতমজুরদের লড়াই এবং সাফল্য এরাজ্যের ও দেশের শ্রমিক-ছাত্র-যুবক-মধ্যবিত্তদেরও অনুপ্রাণিত করেছে। তারাও এই লড়াইয়ের পক্ষে এগিয়ে এসেছে, এগিয়ে এসেছে বিবেকবান শিল্পী-সাহিত্যিক-শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীরাও।

সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের এই ঐতিহাসিক আন্দোলন কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শিক্ষা সমগ্র দেশের গণআন্দোলনের সামনে তুলে ধরেছে —

১। ব্রিটিশ বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের প্রয়োজনে ধনী-গরিব, মালিক-শ্রমিক সকলের যে জাতীয় ঐক্য গড়ে উঠেছিল, ক্ষমতা হস্তান্তরের পর জাতীয় পুঁজিবাদ রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসায় এবং মূল শোষক হওয়ায় সেই জাতীয় ঐক্য আর থাকতে পারে না, সেই জাতীয়তাবাদী আদর্শ আজ আর কাজ করতে পারে না। কারণ ক্ষমতাসীন এই জাতীয় পুঁজিবাদের শোষণ-অত্যাচারের বিরুদ্ধেই আজ লড়াই করতে হচ্ছে। আজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় লুণ্ঠনকারী দেশীয় টাটা, বিদেশি সালিম সহ সকল ইন্ড্রাস্ট্রিয়াল হাউস, চেম্বারস্ অব কমার্স ও তাদের নিয়ন্ত্রিত সংবাদমাধ্যম একদিকে ঐক্যবদ্ধ, অন্যদিকে শোষণে জর্জরিত অগণিত কোটি কোটি শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত জনগণ ঐক্যবদ্ধ। এদের শ্রেণী স্বার্থ পরস্পরবিরোধী।

২। দেশীয় একচেটিয়া পুঁজি ও তার সহযোগী বিদেশী বহুজাতিক পুঁজির স্বার্থেই দেশের রাষ্ট্র, সরকার, সংবিধান, আইন-আদালত, পুলিশ-প্রশাসন কাজ করছে, আর গরিব মানুষকে এসবের বিরুদ্ধে ন্যায়সঙ্গত দাবিতে রক্ত দিয়ে, প্রাণ দিয়ে লড়াই করে দাবি আদায় করতে হচ্ছে।

৩। দেশের 'আইন শৃঙ্খলা রক্ষা', 'গণতন্ত্র', 'শান্তিরক্ষা', 'ন্যায়বিচার' সবই শোষক শ্রেণীর স্বার্থে প্রচারিত ও পরিচালিত, শোষিত জনগণের স্বার্থে নয়।

৪। অত্যাচারী শোষক শ্রেণীর আর্থিক শক্তি, রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন শক্তি, সরকারি-বেসরকারি সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি, প্রচার মাধ্যমের শক্তি যতই শক্তিশালী থাকুক, যতই নৃশংস অত্যাচার ও আক্রমণ চালাক, শেষ পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামী গণআন্দোলনের শক্তিই জয়লাভ করতে পারে।

৫। আজও এই সর্বাত্মক পুঁজিবাদী অবক্ষয়ের যুগে সমাজে মনুষ্যত্ব, মূল্যবোধ, সততা, সাহস, তেজ, নৈতিক বল, অপরের বিপদে এগিয়ে আসার মানসিকতা যতটুকু

বেঁচে আছে, সেটা আছে একমাত্র গরিব মানুষের মধ্যেই, সমাজের তথাকথিত 'ভদ্র', 'মার্জিত' উপরতলায় নয়।

৬। অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য নারীরাও ন্যায়সঙ্গত দাবিতে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বর্বর শক্তির লাঠিতে আহত হয়ে, গুলিতে প্রাণ দিয়ে, এমনকি গণধর্ষিতা হয়েও পুরুষের পাশে দাঁড়িয়ে শেষ পর্যন্ত লড়ে যেতে পারে, সাহস ও তেজের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে।

৭। আজ পুঁজিবাদের আক্রমণের স্বার্থে ভণ্ড মার্কসবাদী সিপিএম, গান্ধীবাদী জাতীয় কংগ্রেস, হিন্দুত্ববাদী বিজেপিরা একদিকে রয়েছে, আর অপরদিকে আছে গণআন্দোলনের উপর ফ্যাসিস্ট আক্রমণ প্রতিরোধ করতে গরিব কৃষক, শ্রমিক জনগণের স্বার্থে যথার্থ মার্কসবাদী এস ইউ সি আই এবং গান্ধীবাদী হয়েও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সংগ্রামকারী তৃণমূল কংগ্রেস।

মনে রাখবেন, একসময় ব্রিটিশ ভারতে অবিভক্ত বাংলা সমগ্র দেশকে নবজাগরণের চিন্তায় ও স্বদেশী আন্দোলনের বিপ্লববাদে অনুপ্রাণিত করেছে। পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে পশ্চিমবঙ্গই বামপন্থা ও গণআন্দোলনের প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করেছে, বর্তমানে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের এই আন্দোলন সমগ্র দেশের কৃষক-ক্ষেতমজুর আন্দোলনে, শ্রমিক আন্দোলনে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে নূতন প্রাণসঞ্চার করেছে। তাই তো সমগ্র ভারতের শহরে গ্রামে সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম আজ গভীর শ্রদ্ধায় উচ্চারিত নাম। আবার এই সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামই দেশী বিদেশী পুঁজিপতিদের এবং তাদের বিশ্বস্ত সেবক কংগ্রেস - বিজেপি - সিপিএম নেতাদের চোখের ঘুমও কেড়ে নিয়েছে।

অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি ফেরৎ, অকৃষি জমিতে শিল্প স্থাপন ও বন্ধ কারখানা খোলার দাবিতে আন্দোলন গড়ে তুলুন

সিঙ্গুরে এখন টাটার ন্যানো প্রকল্প ও অনুসারী শিল্পের প্রশ্ন নেই। ফলে দাবি তুলতে হবে, যারা জমির টাকা না নিয়ে জমি ফেরৎ চাইছে, তাদের জমি প্রকল্প এলাকা থেকেই ফিরিয়ে দিতে হবে। এখন আর অনুসারী শিল্পের অজুহাত দেখানোর কোন সুযোগও নেই। যদিও শিল্পমন্ত্রী পুনরায় আইনের বাহানা দিয়ে বোঝাচ্ছেন, এই জমি ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়। ফেরৎ দেওয়া সম্ভব না হলে তারা একবার ৪০ একর, পরে আবার ৭০ একর জমি ফেরৎ দেওয়ার কথা বলেছিলেন কি করে? একজন প্রবীণ প্রাক্তন প্রধান বিচারপতিও বলেছেন, 'জমি ফেরৎ দেওয়ার ক্ষেত্রে সদিচ্ছা থাকলে আইন বাধা হবে না।' অর্থাৎ সরকার চাইলে জমি ফেরৎ দিতে পারে, প্রয়োজনে নূতন আইন করেই পারে। টাটাদের প্রয়োজনে পুরানো মধ্যযুগীয় ঔপনিবেশিক আইন প্রয়োগ করে সরকার যদি জমি কেড়ে নিতে পারে, তাহলে জমির মালিকদের তাদেরই জমি ফেরৎ দেওয়ার

প্রয়োজনে নূতন আইন করতে পারবে না কেন? ফলে দাবি তুলতে হবে, (১) যারা জমি দেয়নি, তাদের জমি ফেরৎ দিতে হবে, (২) যে এলাকায় কৃষিজমি ধ্বংস করে কারখানার স্ট্রাকচার করা হয়েছে, সেখানে অন্য শিল্প স্থাপন করে স্থানীয় যুবকদের কর্মসংস্থান করতে হবে, (৩) রাজ্যের অকৃষি ও অনুর্বর জমিগুলিতে নূতন শিল্পস্থাপন করতে হবে, (৪) বন্ধ কলকারখানা-চাবাগান খুলে ছাঁটাই শ্রমিক-কর্মচারীদের পুনর্বহাল করতে হবে, (৫) রাজ্য সরকারি অফিসে ও স্কুল-কলেজের সকল শূন্যপদগুলিতে নূতন নিয়োগ করতে হবে। এই দাবিতে রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক গণআন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গের সংগ্রামী ঐতিহ্যসমৃদ্ধ জনগণকে এখন এই আন্দোলনগুলি সুসংগঠিত ও সংঘবদ্ধভাবে পরিচালনার জন্য সর্বত্র নিচুতলায় গণকমিটি গঠন ও ভলান্টিয়ার বাহিনী গড়ে তুলতে হবে। এই কমিটিগুলি ও জনগণ সব সময়ই সব দলের ও নেতাদের বক্তব্য ভাল করে জানবে, সংবাদমাধ্যমের প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে নয়, নিজেরাই মাথা খাটিয়ে বিচার করবে কোনটা ঠিক কোনটা ভুল। মনে রাখতে হবে, কাউকে অন্ধের মত মানলে, এমনকী না বুঝে এস ইউ সি আই দলকেও সমর্থন করলে আবার ঠকতে হবে। আমাদের দলের পরিচালিত শ্রেণীসংগ্রাম ও গণআন্দোলনের আশু লক্ষ্য জনগণের দাবি আদায়, শোষক শ্রেণী ও সরকারি আক্রমণ প্রতিহত করা, আর মূল লক্ষ্য হচ্ছে লড়াই চালাতে চালাতে শ্রমিকশ্রেণী ও শোষিত জনগণকে বিপ্লবী রাজনীতিতে সচেতন, উন্নত নৈতিক বলে বলীয়ান, সুশৃঙ্খল, ঐক্যবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করে পুঁজিবাদবিরোধী সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করা। আজ প্রয়োজন হাজার হাজার ক্ষুদিরাম-ভগৎ সিং-সূর্য সেন-প্রীতিলতা-আসফাকউল্লাদের, যাঁরা অত্যাচারী, মানবতার শত্রু পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহান মার্কসবাদ-লেনিনবাদ-শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারাকে হাতিয়ার করে বুকের রক্ত ঢেলে, প্রাণ দিয়ে লড়াই করে যাবে। সেইজন্য আন্দোলন চালাতে চালাতে অতীত দিনের মনীষীদের ও বিপ্লবীদের জীবন সংগ্রাম ও চরিত্র থেকে শিক্ষা নেওয়ার সংগ্রামও চালিয়ে যেতে হবে। কমরেড শিবদাস ঘোষ আমাদের শিক্ষা দিয়েছেন, 'উন্নত চরিত্রের মান, বিপ্লবীর রাজনীতির প্রাণ।' আজ এদেশে ও বিশ্বে বিপ্লবভীত পুঁজিবাদ-সাম্রাজ্যবাদ চরিত্র-মনুষ্যত্বকে ধ্বংস করছে। আমাদের এই আক্রমণের বিরুদ্ধেও লড়তে হবে।